বিবেকজাগরী বিবেকানন্দ

স্বপন মুখোপাধ্যায়

৯এ, নবীন কুণ্ডু লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

কথামুখ

শ্রী শংকরাচার্যের মেধা ও প্রজ্ঞা আর ভগবান বুদ্ধের হৃদয়ের মিলনে যে ভারতসন্তান বিবেকানন্দের আবির্ভাব তিনি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণর থেকে অভিন্ন। তাঁকে জানলেই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে জানা যায়। শতাধিক বছর ধরে সারা বিশ্বের বহু মহাপুরুষ ও বিদ্বজ্জন অবিরাম নানাভাবে তাঁকে আবিষ্কার করে চলেছেন। আধুনিক ভারতের আত্মা তাঁর মধ্যে মূর্ত হয়ে আছে। তাঁর অধ্যাত্মচেতনায় মানবধর্মের প্রকাশ। তিনি একই সঙ্গে ভারতের আবার বিশ্বের, তিনি ব্যক্তির আবার সমষ্টির। আমাদের মধ্যে যে অনন্ত পুণ্য দেবত্ব রয়েছে তিনিই তাকে জাগরিত করার মন্ত্রদীক্ষা দিয়েছেন। তাঁকে জানা আমাদের ফুরাবে না। আমি আমার মতো করে তাঁকে জেনেছি—আর অন্যদের তা জানাতে চাই। শুধু ভাবের আবেগে ভেসে তাঁর আরতি নয়, যুক্তি এবং ঐতিহাসিক সত্যের নিরিখে বিবেকানন্দ অনুধ্যান। এই বরেণ্য পথপ্রদর্শকের কাছে চলার পথের আলো চেয়ে নেব। তিনি প্রমিথিউসের মতো সত্যের অগ্নিমশাল হাতে দাঁড়িয়ে আছেন। নিজের জীবন-যৌবন সবই ভারতবাসী আর বিশ্ববাসীর কল্যাণ-ব্রতে উৎসর্গ করেছেন। তাঁকে উপেক্ষা করে ভোগবাদিতার নিঃসীম অন্ধকারে ভারতীয় সমাজ দিশাহীন। অথচ পাশ্চাত্য সমাজ মনেপ্রাণে তাঁর বেদান্তের মন্ত্র নিজেদের জীবনচর্যায় কাজে লাগিয়ে প্রগতি ও আলোর পথে এগিয়ে চলেছে।

আমাদের দেশের একদল স্বঘোষিত যুক্তিবাদী মেকি প্রগতিপন্থী, বিবেকানন্দকে উপেক্ষা করার মধ্য দিয়ে নিজেদের আধুনিক প্রগতিশীলতার প্রমাণ ঘোষণা করতে চান। বিবেকানন্দের জীবনকালে এবং উনবিংশ শতাব্দী-জুড়ে এই ধরনের সস্তা কৃত্রিম প্রগতিপন্থীর অভাব ছিল না। তাঁরা বিবেকানন্দের কোনো ক্ষতি করতে পারেননি কিন্তু সমাজের যৌবশক্তির কিছু ক্ষতি নিশ্চয় করতে পেরেছেন। বর্তমানেও এদেরই নতুন করে আবির্ভাব ঘটেছে। সাবধানতা ও প্রতিবাদ প্রয়োজন। যাঁরা অন্যদের বিভ্রান্ত করার জন্য সক্রিয় তাঁরা অনেকেই উচ্চ-শিক্ষিত, ক্ষমতাবান ও প্রতিষ্ঠিত তাই তাঁদের ক্ষতি করার শক্তি কম নয়। বিবেকানন্দের জীবনকালে যাঁরা তাঁর বিরুদ্ধে কলম ধরেছিলেন তাঁদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও সামাজিক প্রতিষ্ঠা যথেষ্ট ছিল।

আজ দ্বিতীয় বিপদ দেখা দিয়েছে ধনের সর্বগ্রাসী দাপটে। ধনলিপ্সা মানুষের মনুষ্যত্বকে হত্যা করে পশু প্রবৃত্তির জয়ধ্বজা তুলে ধরেছে—তার নাম কনজুমারিজম

বা ভোগবাদিতা। যখন দেশে প্রতি দশটি শিশুর মধ্যে তিনটি শিশু পেটে ক্ষুধা নিয়ে রাত্রে কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়ে তখন কোনো একজন শিল্পপতি তিনশো কোটি টাকা ব্যয় করে একটি বসবাসের জন্য চমকপ্রদ অট্টালিকা তৈরি করতে লজ্জা বোধ করেন না। ভোগের লালসা এদের অন্তরকে অন্ধ করে দিয়েছে।

তবু হতাশাকে প্রশ্রয় দেওয়া নয়। বিবেকানন্দ আছেন এবং থাকবেন। তাঁর পথ অনুসরণ করতে হবে প্রতিদিন, প্রতি মুহূর্তের জীবনচর্যায়। শিশু-কিশোর-যুবকদের মধ্যে বিবেকানন্দকে জাগিয়ে তুলতে হবে। এদের সবার মধ্যে বিবেকানন্দ আছেন। তাঁকে আড়াল করে রাখার চেষ্টা হচ্ছে। এই অশুভ শক্তির পরাজয়ের জন্য আমাদের জাগরিত হতে হবে—প্রত্যেকের হাতে গাণ্ডীব তুলে নিতে হবে। আধুনিক যুগের শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বিবেকানন্দ। তাঁর বাণী আমাদের গীতা। তাঁর বাণী ও রচনায় হাত স্পর্শ করে হাজার হাজার স্বাধীনতা সৈনিক ফাঁসির মঞ্চে শহিদ হয়েছেন। আমাদেরও প্রস্তুত হতে হবে। সন্তানদের প্রস্তুত করতে হবে। বিবেকজাগরী বিবেকানন্দ অন্তরে থাকলে জয় আমাদের হবেই।

এই প্রত্যয় ও প্রত্যাশা নিয়ে স্বামী বিবেকানন্দের সার্ধশত জন্মবর্ষে আমি আমার সাধ্য মতো আজকের সমস্যাকাতর জীবনে বিবেকানন্দই যে উদ্ধারের একমাত্র পথ তা ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছি। সাম্প্রতিক কয়েকটি সমস্যার গভীরতা ও ব্যাপকতার কথা মনে রেখে সেগুলির থেকে মুক্ত হবার জন্য কীভাবে স্বামীজির শরণাপন্ন হওয়া উচিত তা নিয়ে আমি নানা আলোচনা সভায় যে বক্তব্য রেখেছি বা শুনেছি তার প্রেক্ষিতে আমার মত জানিয়েছি। আত্মহত্যার মতো এক মহামারি সমস্ত বিশ্বে আতঙ্কের সৃষ্টি করেছে। প্রতি দশ সেকেন্ডে পৃথিবীতে একজন কোথাও আত্মহত্যা করছে এবং তার দশগুণ মানুষ আত্মহত্যার চেষ্টা করছে। বিষয়টি নিয়ে আমি World Suicide Prevention Day-তে সেমিনারে স্বামীজির পথে সমস্যার অনেকটা সমাধান হতে পারে বলে যে মন্তব্য করেছিলাম কয়েকজন মনস্তাত্ত্বিক সে বিষয়ে আমার সঙ্গে একমত হয়েছিলেন। এই বিষয়টি নিয়ে আমি বক্ষ্যমাণ বইটিতে আলোচনা করেছি।

স্বামীজির ধর্ম কখনোই যুক্তি ও বিজ্ঞান থেকে বিযুক্ত ছিল না। স্বামীজি পরিষ্কার বলেছিলেন যা যুক্তি ও বিজ্ঞান মানে না তা ধর্ম নয়। আমি আমার এই বইতে যুক্তিবাদী, বিজ্ঞানমনস্ক বৈদান্তিক বিবেকানন্দের অধ্যাত্মসাধনার স্বরূপ সাধ্যমতো বিশ্লেষণ করেছি। স্বামী বিবেকানন্দ কেবল তত্ত্বকথার বিশ্লেষণ করেননি তিনি জীবনে ও কর্মে তার প্রায়োগিক দিকগুলির দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন যাতে সাধারণ গৃহী মানুষরাও তা কাজে পরিণত করতে পারেন। নিজে যেমন রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন স্থাপন করে নিজের বক্তব্যকে কাজের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠা করে গেছেন

তেমনি তিনি চেয়েছিলেন সবাই কাজে হাত লাগাক। যে যেখানে পারুক যা শ্রেয় বলে মনে করবেন তার জন্য কাজ আরম্ভ করতে হবে। স্বামীজির প্র্যাকটিক্যাল নির্দেশগুলি কী সে বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করেছি।

আমার বাল্যকালে আমার মুক্তমনের শিক্ষক-পিতা আমার হাতে বিবেকানন্দের বাণী ও রচনার সংকলন তুলে দেন। অনেকসময় আমি সেগুলো পড়ে অর্থ বুঝতে পারতাম না তাই পড়ার আগ্রহ থাকত না। আমার বাবা আমাকে তখন গল্প করে যুব সহজে বিবেকানন্দের কথার মূল ভাব বুঝিয়ে দিতেন। বয়েস বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিবেকানন্দচর্চা জীবনের অঙ্গীভূত হয়ে গেল। এর সুফল সারা জীবন পেয়েছি আজও পাচ্ছি। জীবনের নানা ঘাত-প্রতিঘাতে স্বামীজির কথাকে স্মরণ করে সহজে আত্মপ্রত্যয় থেকে বিচ্যুত হইনি। আমি নিজে উপকৃত বলেই এই পরীক্ষিত সত্যের ফল অপরের মধ্যে সঞ্চারিত করে দিতে চাই। তাই স্বামীজির ওপর এই বই লেখার প্রয়াস।

বেহালা দিব্যায়নের অধ্যক্ষ শ্রী শৈলেন মিত্র আমার একান্ত সুহৃদ। তাঁর মতো ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ-মা-সারদামণি ও স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে নিবেদিতপ্রাণ কর্মীর নিকট-সান্নিধ্যে আমার বিবেকানন্দ চর্চা অব্যাহত আছে। আমার স্ত্রী, শিক্ষিকা শ্রীমতী প্রতিমা মুখোপাধ্যায় যে কঠিন পরিশ্রমে ও নিষ্ঠায় আমাকে বিবেকানন্দ ও বেদান্ত অনুশীলনে প্রেরণা ও শক্তি দিয়েছেন তা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি—তাঁর উৎসাহ না থাকলে আমি এ কাজ সমাপ্ত করতে পারতাম না। আমার পরম শুভাকাঙ্ক্ষী শ্রী দেবপ্রসাদ রায় এই বিবেকানন্দ রচনার কাজে নানা পরামর্শ দিয়েছেন। তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

'পুনশ্চ' প্রকাশনার কর্ণধার শ্রী শংকরীভূষণ নায়ক আমার সবকটি বই লেখার শুধু উৎসাহদাতা নন, তিনি অভিভাবকের মতো বই লেখার কাজে আমাকে চালনা করে থাকেন। স্বামী বিবেকানন্দের ওপর লিখতে গিয়ে অনেক সময় মনে নানা সংশয় দেখা দিয়েছে কিন্তু শংকরীদার সঙ্গে আলোচনা করার পর আমার সব সংশয় দূর হয়েছে—তাঁকে প্রণাম জানাই।

স্বামীজির সার্ধশত জন্মবর্ষে স্বামী বিবেকানন্দের ওপর বহু মূল্যবান বই প্রকাশিত হবে। বিদগ্ধজনদের জ্ঞানগর্ভ রচনার পাশে আমার এই ক্ষুদ্র বইটি স্বামীজির প্রতি আমার বিনম্র শ্রদ্ধার্ঘ্য। আজকের কিশোর ও তরুণ সমাজ এবং তাদের অভিভাবকেরা যদি এই বইটি থেকে বিবেকানন্দের আদর্শ অনুসরণে কোনো উৎসাহ পান তবে যে উদ্দেশ্য নিয়ে বইটি লিখেছি তা সফল হল বলে মনে করব।

জানুয়ারি ২০১৩ স্বপন মুখোপাধ্যায়

সূচিপত্র

ভারতের আধ্যাত্মিক জাগরণে বিবেকানন্দ	২১
শ্রীরামকৃষ্ণের নরেন	৪৬
পরিব্রাজক সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের ভারত আবিষ্কার	৫৩
কর্মযোগী স্বামী বিবেকানন্দ	৭৪
সাকার ও নিরাকার—বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ	৮০
প্রতীচীর পথে ভারতপথিক বিবেকানন্দ	৯৪
বিশ্বধর্ম মহাসভায় স্বামীজির ভাষণের তাৎপর্য ও গুরুত্ব	১০১
স্বামীজির প্রতীচী বিজয়	১২১
নারীশক্তির উদ্বোধন	১৩৪
ভারতবাসীর আত্মশক্তি জাগরণে স্বামীজি	১৪৬
অনুব্রতীদের উপর স্বামীজির প্রভাব	১৫৪
ব্যক্তিসমস্যা সমাধানে স্বামীজির পথ	১৬৫
ব্যক্তির বিপন্নতা ও স্বামীজির প্রায়োগিক বেদান্ত	১৭৯
প্রধান সহায়ক গ্রন্থ	১৯২

আমরা ভারতীয়। আমাদের জীবনবোধ ও জীবনাদর্শ আমাদের জাতীয়চরিত্রের মধ্যে গভীরভাবে প্রোথিত। আজকের ভুবনীকরণের দিনেও আমাদের জীবনচর্যায় কোথাও এমন একটা স্বাতন্ত্র্য স্পষ্ট, যা আমাদের ভারতীয় বলে চিহ্নিত করে দেয়। আমরা যদি আত্মানুসন্ধান করে দেখি তবে দেখব আমাদের ভারতীয়তাবোধের উৎসে রয়েছে প্রাচীন মুনি-ঋষিদের কঠোর সাধনালব্ধ চিন্তাসম্পদ। ভারতীয় অধ্যাত্মসাধনার ভিত্তিভূমি প্রাচীন তপোবনগুলি যেখানে ঋষিদের আত্মোপলব্ধির মধ্যে ঠাঁই পেয়েছিল সর্বজনীন দুঃখানুভূতি। তাঁরা সর্বভূতের মধ্যে নিজেদের উপলব্ধি করতে পারতেন এবং নিজেদের মধ্যে সর্বভূতের স্পন্দন উপলব্ধি করতেন। এইভাবে প্রাচীন অধ্যাত্ম-সাধনার মাধ্যমে ঋষিরা যে সত্যের সন্ধান পান তাই আমাদের শ্রেষ্ঠ জাতীয় সম্পদ। এই সম্পদ কোনো একটি দেশের গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না, তাই এই সম্পদের অধিকারী সমগ্র বিশ্ব এবং সমগ্র বিশ্বজন একসময় তা শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণও করেছিল। তবু ভারতবাসী বলে আমাদের হৃদয়ে এই প্রাচীন আদর্শের প্রতি একটি বাড়তি আকর্ষণ আছে। সমাজ জীবনের বহিরঙ্গে অপরিহার্য নানা পরিবর্তন সত্ত্বেও ভারতীয়তাবোধের সেই প্রাচীন স্বরূপটি একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি। আমাদের অধ্যাত্মদৃষ্টিতে ও নৈতিকতায়, ভোগবাদিতায় নিমজ্জনকে উপেক্ষা করার যে একটা স্বাভাবিক প্রবণতা রয়েছে তাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করা যাবে না। এই প্রবণতা প্রাচীন আদর্শের প্রতি আমাদের অমলিন শ্রদ্ধার প্রতিফলন। তাই আমাদের জাতীয় নায়ক-পুরুষ কোনো রাজা নন, ধনী নন, কোনো ঋষি- পুরুষ।

ভারতীয় অধ্যাত্মসাধনার গৌরব প্রাচীন বিশ্বে এতটাই শ্রদ্ধার সঙ্গে প্রচারিত ছিল যে বিশ্বের প্রাচীন ধর্ম ও সংস্কৃতি কেবল সেই মেধাসম্পদের আকর্ষণে ভারতের পথে আকৃষ্ট হত। কোনো প্রাচীন ধর্ম নিজভূমে আক্রান্ত হলে তারা অনায়াসে প্রথমেই আশ্রয়ের জন্য ভারতবর্ষের কথা ভাবত। ভারতও উন্মুক্ত হৃদয়ে তাঁদের আশ্রয় দিয়ে নিজেদের মেধাসম্পদকে আরও সম্পন্ন করে তুলত। একইভাবে ইহুদিধর্ম আক্রান্ত হলে ইহুদিধর্মাবলম্বীরা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ার আগে ভারতবর্ষে চলে আসে। এইভাবে খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দীতে ভারতে ইহুদিধর্মের আগমন। এমনকি খ্রিস্টধর্মও ইংল্যান্ডে পৌঁছোনোর দুশো বছর আগেই ভারতে পৌঁছে যায়। খ্রিস্টধর্ম

ভারতে আসে চতুর্থ শতাব্দীতে অথচ তখনও খ্রিস্টধর্ম ইংল্যান্ডে পৌঁছোয়নি। পারসিরাও পারস্য থেকে বিতাড়িত হয়ে অষ্টম শতাব্দীতেই ভারতবর্ষে চলে আসে। ক্রমে পৃথিবীর সর্বত্রই রাজনৈতিক আধিপত্যকে কেন্দ্র করে ধর্মীয় হানাহানি ও ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা মানুষের ধর্মীয় চেতনাকে বিভ্রান্ত করে তোলে। সপ্তম শতাব্দীতে আরব অভিযানের মধ্য দিয়ে ভারতে ইসলাম ধর্মের প্রবেশ। তবে ইসলাম ধর্ম কোনো ধর্মীয় উদ্দেশ্য নিয়ে ভারতে প্রবেশ করেনি। অষ্টম শতাব্দীতে জড় সম্পদের লোভেই ভারতে আরবের আক্রমণ। সঙ্গে ধর্মের ধ্বজা থাকলেও আধ্যাত্মিক মিলন গোড়াতে হয়নি। ধীরে ধীরে ভারতের জ্ঞান, বিজ্ঞান, সাহিত্য, সংস্কৃতি আরব বিদ্যোৎসাহীদের আকৃষ্ট করে। গজনির সুলতান মামুদ ১০০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে প্রায় সতেরো বার ভারত আক্রমণ করেন। ধনরত্ন লুঠ করাই মামুদের প্রধান উদ্দেশ্য হলেও ভারতে ইসলাম রাষ্ট্র গড়ে তোলার একটা প্রচ্ছন্ন উদ্দেশ্য তার ছিল। হিন্দু শিল্পকীর্তি, মন্দির ধ্বংস এবং সেই সঙ্গে সোমনাথ মন্দিরের বহুমূল্যবান ধনরত্ন লুঠ করে তিনি ভারতের অর্থনৈতিক সংকটকে প্রকট করে তোলেন কিন্তু তিনিও ভারতের অধ্যাত্মসম্পদের গৌরব ধ্বংস করতে পারেননি। ভারতীয়দের মধ্যে ইসলাম সম্পর্কে প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া ছিল ভয়ের এবং বিতৃষ্ণার। অবুরৈহান মুহম্মদ ইবন আহমদ আলবেরুনি ৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে খিবাতে জন্মেছিলেন। সুলতান মামুদ তাঁকে বন্দি করে অন্যদের সঙ্গে নিজের রাজ্যে নিয়ে আসেন। পরে আলবেরুনি সুলতান মামুদের লুণ্ঠনকারী সেনাদলের সঙ্গে ভারতে আসন এবং ১০১৭ থেকে ১০৩০ অবধি ভারতে থাকেন। একথা ঠিক তিনি ভারতবর্ষে ইসলাম ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে ইসলাম ধর্মকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন কিন্তু তিনি ছিলেন প্রকৃত জ্ঞানান্বেষী পণ্ডিত ব্যক্তি; তাই ভারতবর্ষের চিন্তাসম্পদ তাঁকেও আকৃষ্ট করে। তিনি সংস্কৃত ভাষা শিখে ভারতবর্ষের ইতিহাস গ্রন্থ তারিখ অল-হিন্দ লেখেন। তিনি পতঞ্জলির যোগদর্শন, কপিলের সাংখ্য এবং বরাহমিহিরের বৃহৎ সংহিতা অনুবাদ করেন। আলবেরুনি ভারতবর্ষের ধর্ম ও দর্শনের শ্রেষ্ঠ কেন্দ্রগুলি (কাশ্মীর বা বারাণসী) দেখবারই সুযোগ পাননি ফলে তাঁর বিশ্লেষণ যথেষ্ট ত্রুটিপূর্ণ। তবু তাঁর মাধ্যমেই আরব দুনিয়ায় ভারতবর্ষের ধর্মসাধনার ও জ্ঞানভাণ্ডারের একটা প্রাথমিক ধারণা পৌঁছে যায়। ভারতবর্ষের অধ্যাত্মসাধনার চিরাচরিত প্রবাহ ইসলামের আগ্রাসনে বন্ধ হয়ে যায়নি। উত্তরের পণ্ডিতকুল অনেক সময় ভয় পেয়ে পুথিপত্র নিয়ে দক্ষিণে পালিয়েছে কিন্তু প্রাচীন অধ্যাত্মসাধনায় ছেদ পড়েনি।

ক্রমে ভারতবর্ষে মুসলমান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। লুণ্ঠনকারীরা ভারতবর্ষ থেকে ধনরত্ন লুঠে নিয়ে গেছে কিন্তু মুহম্মদ ঘুরি ও তাঁর পরবর্তী শাসকরা ভারতবর্ষকে নিজেদের দেশ ভাবতে শুরু করে। ক্রমে ইসলাম ও ভারতের প্রাচীন ধর্মগুলির মধ্যে একটা সহাবস্থানের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। অসহিষ্ণু মনোভাব কেটে যেতে

থাকে এবং পরস্পরকে বোঝবার জন্য পরস্পরের কাছে আসবার একটা প্রবণতা দেখা দেয়। সাহিত্য, সংস্কৃতি, বিজ্ঞানের পাশাপাশি ধর্মীয় ভাব ও আচরণের মধ্যে একটা মিলনের ক্ষীণ সুর প্রবাহিত হতে থাকে। পারস্পরিক বিদ্বেষ, দ্বন্দ্ব, সংঘাত, অবিশ্বাস ছিল আবার যৌথ সাধনার একটা মিলিত প্রয়াসও আমাদের দৃষ্টি এড়ায় না। বাইরে থেকে আক্রমণ যত তীব্র হয়েছে প্রাচীন চিন্তাসম্পদকে আঁকড়ে ধরার একটা প্রয়াস লক্ষ করা গেছে। ইংরেজরা ভারতবর্ষের শাসনক্ষমতা নিজের হাতে তুলে নেবার আগে অবধি ভারতবাসী শত আক্রমণেও নিজেদের অধ্যাত্মসম্পদের উত্তরাধিকারের গৌরব ত্যাগ করেনি। তুর্কি অভিযানকারীরা ভারতে আরব-পারস্য সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন কিন্তু ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে মিলনে এক যৌথ সংস্কৃতিও গড়ে উঠেছে। রহস্যবাদী সুফি মুসলমানদের সঙ্গে হিন্দুদের যোগসাধনা ও ভক্তিসাধনার মিলন এক মিশ্র সংস্কৃতির জন্ম দিল। চৈতন্য পূর্ববর্তী বৈষ্ণব আন্দোলন ও সুফি আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ইসলাম ও হিন্দুধর্মের সমন্বয়সাধনের প্রয়াস অনেকটা সফল হয়েছিল। ১৪৮৫ খ্রিস্টাব্দে নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব শুধু বাংলা নয় সমগ্র ভারতবর্ষে হিন্দুধর্মের পক্ষে একটি যুগান্তকারী ঘটনা। শ্রীচৈতন্যদেব ভক্তিবাদের আলোকে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সমস্ত মানুষকে ভগবত সাধনার যে নতুন পথ দেখান তার মধ্যে যেমন ছিল নিরভিমান মানবপ্রেম তেমনি ছিল আদর্শের প্রতি দ্রঢ়িষ্ঠ আনুগত্য। মুসলমান শাসকগোষ্ঠীর কাছ থেকে বাধা এলে শ্রীচৈতন্য অনুগামীদের সঙ্গে নিয়ে মশাল হাতে অন্যায়ের প্রতিবাদ করেন। শ্রীচৈতন্য হিন্দুধর্মের মানবিক আধ্যাত্মবাদ প্রতিষ্ঠায় ইতিহাসের এক জটিল সময়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনে সক্ষম হয়েছিলেন।

ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের প্রতিষ্ঠা ও প্রসার প্রথম দিকে ভারতবর্ষের ধর্মীয় ভাবনার উপর কোনো প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টা করেনি বরং বলা যায় ধর্ম-বিষয়ে হাত দিতে গিয়ে পাছে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর প্রবল বিরুদ্ধ মনোভাবের মুখোমুখি হতে হয় এই কথা চিন্তা করে তারা ধর্ম প্রচার থেকেও দূরে থাকতে চেয়েছিল। প্রায় আটশো বছরের মুসলমান শাসন ভারতবর্ষের ধর্মীয় আচরণকে অন্তর্মুখী করে তোলে। ভারতবর্ষের যে ধর্মীয়দর্শন এক সময় সমস্ত বিশ্বে আদৃত হত সেই দর্শন কেবলমাত্র আচারসর্বস্ব নিয়মনীতির বেড়াজালে আটকে পড়ল। কূপমণ্ডূকতা ধর্মধ্বজীদের এমনভাবে গ্রাস করে যে সমস্ত সমাজ কুসংস্কারের কাদাজলে ডুবে যেতে বসে। স্বভাবতই যুক্তিবাদী যুবসম্প্রদায় হিন্দুধর্মের নামে অমানবিক কুসংস্কারে জর্জরিত প্রথাগুলি সম্পর্কে বীতশ্রদ্ধ হয়ে হিন্দুধর্মের প্রতি আস্থা হারায়। হিন্দুধর্মের এমন সংকট ইতোপূর্বে কখনও এমন প্রকট হয়ে ওঠেনি। এই অবস্থার পূর্ণ সুযোগ নিতে শুরু করে ইংরেজ শাসকশ্রেণি। তারা নিজেদের শাসনের মুঠি শক্ত করতে ধর্মীয় দুর্বলতার ছিদ্রপথে ভারতীয়দের অতীত-বিচ্ছিন্ন করে তোলার চেষ্টা করে।

একদল স্বার্থান্বেষী ইংরেজ বুদ্ধিজীবী প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে ভারতীয়দের কোনো অতীত গৌরব নেই, ইতিহাস নেই, উন্নত ধর্মীয় চেতনা নেই, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য নেই। ভারতবাসী একটি বর্বর জাতি। ভারতবর্ষের অন্তত চার হাজার বছরের ইতিহাসে ভারতবাসী কখনও এমন অতীত-বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েনি। ভারতীয় ধর্মসাধনায় পৌত্তলিকতাকে আক্রমণ করে খ্রিস্টান মিশনারিগণ ভারতবর্ষের অধ্যাত্মসাধনাকে সভ্যতার আলোকবর্জিত এক বর্বর আচরণ বলে অভিহিত করে।

একদিকে যেমন ভারতবিদ্বেষী বুদ্ধিজীবীদের উদ্দেশ্যমূলক প্রচার ভারতবর্ষের শিক্ষিত শ্রেণির মধ্যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করল তেমনি আবার ভারতবন্ধু কয়েকজন ইংরেজ পণ্ডিত ভারতের প্রাচীন ধর্ম, দর্শন ও সংস্কৃতি সম্পর্কে গভীর আগ্রহ প্রকাশ করলেন। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একজন আইনজ্ঞ কর্মচারী উইলিয়াম জোনস এমনই একজন বিদগ্ধ ইংরেজ। তিনি ১৭৮৩ খ্রিস্টাব্দে ভারতে আসেন এবং ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল প্রতিষ্ঠা করলেন। ভারতবিদ্যার অনুসন্ধানে উইলিয়াম জোনস এবং তাঁর প্রতিষ্ঠান এশিয়াটিক সোসাইটির অবদান চিরকাল উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। তিনি গীতা, মনুস্মৃতি এবং শকুন্তলা অনুবাদ করার জন্য এশিয়াটিক সোসাইটির পক্ষ থেকে উদ্যোগ নেন।

উনবিংশ শতাব্দীর একেবারে গোড়ায় ভারতীয় সমাজের এমনই এক ক্রান্তিকালে রাজা রামমোহন রায়ের আবির্ভাব। রাজা রামমোহন রায়ের জীবনকাল (১৭৭২-১৮৩৩) শুধু ভারতবর্ষে নয় পৃথিবীর ইতিহাসেরও এক যুগসন্ধিক্ষণ, তাঁর জন্মসময়েই আমেরিকার স্বাধীনতা আন্দোলন (১৭৭২-১৭৮৩) আরম্ভ হয়। এক অসাধারণ প্রতিভাবান পুরুষ রাজা রামমোহন বাংলার প্রথম বিশ্বমনস্ক আধুনিক সমাজবেত্তা যুগপুরুষ। সংস্কৃত, হিন্দি, উর্দু, আরবি ও ফারসি ভাষায় তাঁর অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল এবং চাকরিসূত্রে রংপুরে এসে ইংরেজি ভাষা এমন সুন্দর রপ্ত করেন যে জেরেমি বেন্থাম তাঁর ইংরেজি ভাষাজ্ঞানের প্রশংসা করে বলেন যে তিনি যেন রামমোহন রায়ের মতো ইংরেজি লিখতে পারেন, এটাই তাঁর ইচ্ছা (রামমোহন চর্চা ইতিহাসে বঞ্চনা ও অবহেলা/নির্মাল্য বাগচী পৃ: ১৭১)। স্মরণ করা যেতে পারে জেরেমি বেন্থাম লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম প্রধান প্রতিষ্ঠাতা।

বহুভাষাবিদ হওয়ায় রামমোহন বাইবেল, কোরান, ত্রিপিটক, বেদ, বেদান্ত মূলভাষায় পড়বার সুযোগ পান এবং বেদান্ত থেকে একেশ্বরবাদ ও নিরাকার উপাসনাকে গ্রহণ করে ব্রহ্মোপাসনার প্রবর্তন করেন। রামমোহন মনে করতেন ব্রহ্মোপাসনার জন্য সন্ন্যাস গ্রহণের কোনো প্রয়োজন নেই। গৃহীরাও ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করতে পারে। তিনি শূদ্র ও নারীরও বেদপাঠ ও ব্রহ্মোপাসনার অধিকার আছে বলে বৈপ্লবিক মত প্রকাশ করেন। তিনি শংকরের মায়াবাদকে ভ্রান্ত বলে মনে করতেন। ১৮০৩-০৪ সালে তুহফৎ-উল-মুওয়াহিদ্দিন রচনা করে রাজা

রামমোহন রায় ধর্ম বিষয়ে যুক্তিবাদকে তুলে ধরলেন। বইটির ভূমিকা আরবিতে লেখা এবং মূল রচনা ফারসিতে। তখনও শিক্ষিত মানুষের মধ্যে ইংরেজির প্রচলন হয়নি, তবে উন্নত শ্রেণির শিক্ষিতজনেরা সবাই ফারসি জানতেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বাংলার নবজাগরণের প্রথম আলোকে রামমোহন রায়ের ভূমিকা অবিস্মরণীয়। মোহিতলাল রামমোহনের যথার্থ মূল্যায়ন করে বলেছেন—

'রামমোহন, অতি সূক্ষ্ম অধ্যাত্মবাদের সন্ন্যাস বৈরাগ্য ও সর্বপ্রকার গুহ্যসাধনা, যাহা জীবনকে কুণ্ঠিত ও জরাগ্রস্ত করিয়া রাখিয়াছিল এবং চারিত্রিক দুর্বলতা বৃদ্ধি করিয়া জাতির সকল ক্ষেত্রে মিথ্যাচারকে প্রশ্রয় দিয়াছিল, তাহার উচ্ছেদ সাধন করিয়া জাতির মনকে মুক্ত করিয়াছিলেন, ইহাই সে যুগের প্রথম বিদ্রোহ ঘোষণা' (শনিবারের চিঠি, ভাদ্র ১৩৫০/বাংলার নবযুগ ও কবি শ্রীমধুসূদন)।

রাজা রামমোহন রায় পাটনার বিখ্যাত মাদ্রাসায় ইসলাম ধর্ম ও ইসলামীয় সংস্কৃতি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করায় তিনি ইসলামের একেশ্বরবাদকে খোলা মনে গ্রহণ করতে পারলেন এবং তারই ফলে একেশ্বরবাদীদের উদ্দেশ্যে নিবেদন বা 'তুহফাৎ-উল-মুওয়াহিদ্দিন' রচনা করলেন। তবে তিনি ইসলামের গোঁড়ামির বিরুদ্ধাচরণ করায় মুসলমানরা তাকে খোলা মনে গ্রহণ করতে পারল না, এমনকি মৌলবাদীরা তাঁকে হত্যার চেষ্টাও করে। আবার মুসলমানরা যেমন তীব্র পৌত্তলিকতা বিরোধী সেরকম পৌত্তলিকতার বিরোধিতা করায় গোঁড়া হিন্দুরাও রামমোহনের তীব্র বিরোধী ছিল।

খ্রিস্টান মিশনারিরা প্রাচীন হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে কুৎসা রটাতে শুরু করলে রামমোহনের যুক্তিবাদ তাদের প্রচারের সামনে প্রথম বাধা হয়ে দাঁড়ায়। হিন্দুধর্মের মধ্যেই যে একেশ্বরবাদের কথা রয়েছে সেটা আর অস্বীকার করা গেল না। যে ইয়ং বেঙ্গল অতীত ঐতিহ্যসম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকায় হিন্দুধর্মের প্রতি গভীর অশ্রদ্ধা পোষণ করতে শুরু করেছিল তাদের মধ্যে একাংশ রামমোহনের যুক্তিনিষ্ঠ মতবাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে অতীত ঐতিহ্যসন্ধানী হয়ে উঠল। যাঁরা একসময় ডিরোজিওর শিষ্য ছিলেন তাঁরা অনেকেই রামমোহন রায়ের মধ্যে নিজেদের যুক্তিবাদী মননের আশ্রয় পেলেন। এঁদের মধ্যে রামতনু লাহিড়ি, চন্দ্রশেখর দেব, তারাচাঁদ চক্রবর্তী, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, শিবচন্দ্র দেব উল্লেখযোগ্য। এদিক দিয়ে বিচার করলে রামমোহন তাঁর ব্রাহ্মসভার মাধ্যমে সমাজের শিক্ষিত উচ্চস্তরের হিন্দুদের মধ্যে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে নিজেদের যুক্তিবাদী অধ্যাত্মভাব প্রকাশের একমাত্র উপায় না মনে করে একটা বিকল্প পথের সন্ধান দিলেন। ১৭৮৯ এর ফরাসি বিপ্লব রামমোহনের অন্তরে গভীরভাবে রেখাপাত করেছিল। তিনি চাইলেন ভারতবর্ষও পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান, যুক্তিবাদ ও সাম্যভাবনার আলোর স্পর্শ পাক।